সার্ধশতবার্ষিক স্মরণ

এসেছে শরৎ হিমের পরশ

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

শীতপ্রধান দেশে উষ্ণতাই কাম্য, তাই সেখানে উষ্ণ অভ্যর্থনা, উষ্ণ সম্ভাষণ ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, আমাদের অভ্যর্থনায় শীতলতাই প্রধান—শীতল পানীয়, শীতল বাতাস ও প্রাণজুড়ানো কথা। তাই শরৎ ঋতুর হাওয়ায় শীতলতার ছোঁয়া আমাদের গ্রীষ্মাবসানের খবর দিয়ে মনে আনন্দ জাগায়। ঠিক এই শরৎ ঋতুর মতন শ্রীরামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যে ও তারপর মাতৃভুবনে শ্রীরামকৃষ্ণচিহ্নিত পার্ষদ শরৎচন্দ্রের নীরব প্রবেশ। প্রবেশের ভারপ্রাপ্ত উদ্দেশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবরূপী শিশুটিকে তাঁর সহস্র ফণাযুক্ত ছাতার তলায় রক্ষা করা ও তার মাধ্যমে জগদ্‌ব্যাপী ভবিষ্যৎ ভক্তবৃন্দের হৃদয় মলয়পবনের আনন্দে ভরিয়ে তোলা। এটি কোনও কাব্যিক অতিশয়োক্তি নয়, তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে এ-বিষয়ের ধ্রুবসত্যতা উপলব্ধি হয়।

বালক শরতের কোলে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভারবহনের ক্ষমতা পরীক্ষা করেছিলেন। স্বামীজী নিজের রোপিত ব্যাবহারিক বেদান্তের বীজ মহীরূহে রূপান্তরিত করার ভার তাঁর ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। সর্বোপরি, তাঁর সম্বন্ধে শ্রীমায়ের অভিধাগুলি—'শরৎ হচ্ছে আমার ভারী,' 'নরেনের পর এতবড় প্রাণ আর একটিও পাবে না,' 'ও আমার বাসুকী, যেখানে জল পড়ে সেখানেই ছাতা ধরে' ইত্যাদি সেকথাই প্রমাণ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের পরীক্ষান্তে তাঁদের সম্বন্ধে ইঙ্গিতমাত্র দিয়ে গিয়েছিলেন, যার সত্যতা পরে প্রমাণিত। তিনি বালক শরতকে বলেছিলেন, ''সবসময় নিজেকে শিব আর আমাকে শক্তি ভাববি।'' হয়তো এই ভাবনাতেই তাঁর তন্ত্রমতে শক্তিসাধনা ও সিদ্ধি। আর এই সিদ্ধি তাঁর জীবনে সদাই পরিস্ফুট, যার স্বীকৃতি আমরা তাঁর 'ভারতে শক্তিপূজা' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে পাই—''যাঁহাদের করুণাপাঙ্গে গ্রন্থকার জগতের যাবতীয় নারীমূর্তির ভিতরে শ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তির প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদেরই শ্রীপাদপদ্মে এই পুস্তিকাখানি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে অর্পিত হইল।'' শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবদৃষ্টিতে শরতকে ঋষিকৃষ্ণের (যিশুখ্রিস্টের) দলে দেখেছিলেন। সেটির সত্যতা প্রমাণিত হল বহুবছর পরে, যখন তিনি স্বামী সারদানন্দ—আমেরিকা থেকে স্বামীজীর ডাকে কার্যভার গ্রহণ করতে যাচ্ছেন এবং পথে রোমের ভ্যাটিকান শহরে সেন্ট পিটার্স চার্চ দর্শন করতে গিয়েছেন। সেখানে বেদিমূলে তাকিয়ে তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। সাধু পিটারকে যিশু বলেছিলেন—তুমিই সেই প্রস্তরখণ্ড যার উপর

খ্রিস্টসাম্রাজ্য গড়ে উঠবে। স্বামী সারদানন্দজীর আত্মমগ্নতায় হয়তো সেই কথারই পুনরাবৃত্তি ধ্বনিত হচ্ছিল যে, তাঁর ধীর স্থির আধ্যাত্মিক ভারবহন করার ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য গঠিত হবে।

শ্রীমায়ের সৃষ্ট এই ভুবনে শ্রীমায়েরই ভাষায় তাঁর শরৎ 'সৃষ্টিধর'। তাঁর সৃষ্টিধরত্বের গুণ শৈশব থেকেই, যেটি তাঁর অসীম আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষমতা। স্বামীজী বলতেন, শরতের বেলেমাছের রক্ত, কিছুতেই তাতে না। সারাজীবন তাঁর এই আত্মনিয়ন্ত্রণ দেখে বোঝা যেত এ কষ্টকৃত বা সাধনলব্ধ নয়, এ যেন তাঁর জন্মগত চরিত্রের অঙ্গ, যা সাধনান্তে আরও অতলস্পর্শী হয়ে উঠেছিল। তাঁর জীবনে যার অসংখ্য উদাহরণ উত্তরপুরুষের প্রেরণা হয়ে বিরাজ করছে।

সাধনাবস্থায় স্বামী সারদানন্দ, হরিভাই—স্বামী তুরীয়ানন্দ ও বৈকুণ্ঠনাথ—তখন স্বামী কৃপানন্দ হিমালয়ে ঘুরছেন। নীলকণ্ঠেশ্বর দর্শন করে প্রায় সন্ধ্যায় বন্যজন্তু অধ্যুষিত এক অঞ্চলে তাঁরা পথ হারালেন। বিপত্তি চরম হল যখন স্বামী সারদানন্দ বাকি দুজনের সঙ্গছাড়া হয়ে গেলেন। তুরীয়ানন্দজী অপর গুরুভাইকে নিয়ে কোনওক্রমে এক গ্রামে পৌঁছলেন। উৎকণ্ঠায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে সকালে গ্রামের লোক সঙ্গে নিয়ে সারদানন্দকে খুঁজতে বেরোলেন। বহু খোঁজার পর তাঁকে দূরে এক পাথরের ওপর ধ্যানসমাহিত বাহ্যশূন্য অবস্থায় পাওয়া গেল।

এ-ঘটনা সকলের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। পরবর্তী কালে সারদানন্দজী কাশীতে অসুস্থ তুরীয়ানন্দজীর তপস্যাপূত জ্ঞানীর অবস্থা শুনে তাঁকে প্রণাম করতে চললেন। নিরভিমান স্বামী সারদানন্দ তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে উঠতেই হরি মহারাজ দুঃখিতস্বরে বললেন, ''আমি অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না, তাই ভাই তুমি আমাকে এইভাবে অপ্রস্তুত করলে! আমি কি জানি না তুমি কে?''

বাগবাজার থেকে স্বামী সারদানন্দ বেলুড় মঠে আসছেন নৌকায়, সঙ্গে ডাক্তার কাঞ্জিলাল। হঠাৎ আকাশ কালো করে ঝড় উঠল। ছোট নৌকা টলমল, ডুবে যাওয়ার উপক্রম। যাত্রীরা ভয়ে আর্ত চিৎকার করছে, ডাক্তার কাঞ্জিলাল দেখছেন শরৎ মহারাজ নিশ্চিন্তে তামাক টানছেন। নৌকার অবস্থা যখন গুরুতর তখন ধৈর্য হারিয়ে ক্রোধে কাঞ্জিলাল মহারাজের ছিলিমটা তুলে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন—সবাই ডুবতে বসেছি, আর আপনি নিশ্চিন্তে ছিলিম টানছেন! ধীরতার প্রতিমূর্তি শরৎ মহারাজ হেসে বললেন, ''তামাক খাব না তো নৌকা না ডুবতেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নাকি?'' অবশ্য শেষ পর্যন্ত কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।

তিনি মায়ের ভারী। শ্রীমা বলছেন—''শরৎই সর্বপ্রকারে পারে।'' এই সবরকমের সেবার মধ্যে শুধু স্থূল মাতৃশরীরটি পড়ে না। তাঁর আত্মীয়স্বজন, তাঁর প্রতিবেশী, তাঁতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ভক্ত ও সন্ন্যাসিবৃন্দ, তাঁর দীক্ষিত-অদীক্ষিত অগণন সন্তান—সকলেরই ভার আজীবন বহন করেছেন বিনা দ্বিধায়। তাঁর উপর শ্রীমায়ের নির্ভরতা এতটাই যে তাঁর ঘোর বিষয়ী ভাইদের পারস্পরিক ঝগড়ার ফলে বিষয়সম্পত্তি ভাগ করতে তাঁর ভারী শরতকেই ডেকে পাঠান; এবং কামকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী মাতৃইচ্ছাপূরণের জন্য মধ্যস্থতা করতে জয়রামবাটী পৌঁছন। দলিল ভাগ থেকে রেজিস্ট্রি পর্যন্ত শত উত্তেজনার মধ্যেও তিনি ধীর স্থির।

শরৎ মহারাজ নিজে আচরণ করে সেবার ধারাটি স্থির করে দিয়ে গিয়েছেন। সেটি গুরুজনদের ক্ষেত্রে যেমন, শিবরূপী জীবের সেবার ক্ষেত্রেও তেমন। কখনও নিজের কোনও ইচ্ছা শ্রীমায়ের উপর চাপিয়ে দেননি। একবার শ্রীমায়ের অসুখে তাঁর কাছ থেকে মুড়ি-ছোলাভাজার বাটিটি ভিক্ষা করে নিয়ে এসেছিলেন; সেটি পথ্য হিসাবে শ্রীমায়ের শরীরের

পক্ষে অনুচিত জেনে। তাঁর ইচ্ছার এইটুকু বিরোধিতা তাঁকে মর্মদাহ দিয়েছিল; শ্রীমায়ের শরীরত্যাগের পর স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে মুড়ি-ছোলাভাজা খাইয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করেন। আর স্বামীজী প্রবর্তিত শিবরূপী জীবের সেবার সম্বন্ধে তাঁর চিরকালীন এক দিগ্‌দর্শী উপদেশ—''পরের টাকা পরকে দিবি; তুই কি দিবি? তুই দিবি তোর হৃদয়, প্রাণ-মন, ভালবাসা।''

শরৎ মহারাজ নিজেকে মায়ের বাড়ির দ্বারী বলতেন এবং সেটি কথার কথা ছিল না। এক ভক্ত উদ্বোধন বাড়িতে এসে শরৎ মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তারপর মাকে প্রণাম করতে যাচ্ছেন। শরৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, ''এত বড় প্রণামটা যে করছ, এর মানে কি বল তো?'' তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, ''সেকি, মহারাজ, আপনাকে প্রণাম করব না তো করব কাকে?'' তিনি শুনে বললেন, ''তুমি যাঁর কৃপা পেয়েছ, আমিও তাঁরই মুখ চেয়ে বসে আছি। তিনি ইচ্ছা করলে এখনি তোমাকে আমার আসনে বসিয়ে দিতে পারেন।''

এই নিরভিমানিতা তাঁর অন্তরে এত স্বাভাবিক ছিল যে সাধারণ সম্পাদকের পদমর্যাদার গৌরব তাঁর আচরণে কখনও প্রকাশ পেত না। বৃন্দাবন থেকে একজন সাধু এসেছেন উদ্বোধনে। চিঠি দিয়েই এসেছেন। কিন্তু কোনও কারণে সে-চিঠি পড়া-হয়ে-যাওয়া চিঠির গোছায় মিশে গেছে। সারদানন্দজী তাঁকে না জানিয়ে হঠাৎ আসার জন্য ভর্ৎসনা করলেন এবং তার পরই চিঠিটি আবিষ্কার হল। মহারাজ মর্মাহত হয়ে রাজা মহারাজকে তাঁকে এই পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য আর্জি জানালেন এবং শিষ্যপ্রতিম সেই সাধুটির কাছে দুঃখপ্রকাশ করলেন।

কাশীতে এক সেবক কর্মী গরিবদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল বিতরণে ঘোর আপত্তি জানালেন। স্বামী সারদানন্দজী সেটি শুনেই নিজের ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তখন সেই সেবকের বোধোদয় হল। পূজনীয় ভূতেশানন্দজীর স্মৃতিচারণে শুনেছি যে এক সাধুর নৈতিক পতন হলে স্বামী ওঁঙ্কারানন্দজী তাকে ধরে নিয়ে শরৎ মহারাজের কাছে যান। তিনি সেই সাধুটির সম্বন্ধে বিস্তারিত শুনে অনঙ্গ মহারাজকে অনুরোধ করলেন বিনীতভাবে—''দেখ ছেলেটি অতি গর্হিত কাজ করেছে সন্দেহ নেই, তবে তোমরা তাকে আর একটা সুযোগ দাও।'' স্বরে আদেশের কোনও সুর নেই, সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার অধিকারের প্রয়োগ নেই, বরং অনুরোধ ও প্রার্থনা সাধুটির জন্য।

আর একবার এক সাধু কর্মী তাঁর হিসাবের ভুল ধরায়, হিসাববিদ্যায় পারদর্শিতার অভিমানে শরৎ মহারাজকে বলছেন, ''আপনি আমার হিসাবে ভুল ধরছেন, আপনি অ্যাকাউন্টসের কি বোঝেন?'' শরৎ মহারাজ শুধু বললেন, ''ওরে অতদূর ভাল নয়।'' সাধুটি নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চান।

ভক্তদের দেওয়া একটি উপদেশে শরৎ মহারাজ নিজের কর্মজীবনের চিত্রটি যেন তুলে ধরেছেন : ''যদি কাজই করতে চাও, তবে ভগবানের ওপর নির্ভর করে নিজের পায়ে দাঁড়াও। কোনও মানুষের মুখ চেয়ে থেকো না—আমারও না। কেউ তোমায় সাহায্য না করলেও তুমি একলা ওই কাজ করে দেহপাত করবে—এরূপ তেজ, সাহস, ভগবানে নির্ভর নিয়ে যদি কাজ করতে পার তো কর।''

স্বামীজীর 'শিরদার তো সরদার' কথাটি মেনে মহারাজ নিজের মাথা সঙ্ঘের পায়ে অর্পণ করেছিলেন সম্পাদকত্বের প্রথম দিন থেকেই। স্বামী ভূতেশানন্দজীর স্মৃতি—''তাঁকে একদিন এক সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের কর্মপদ্ধতির কোনও নিয়মকানুন নেই, তাই যে যেভাবে কাজ করে সে মনে করে সেটাই মঠ মিশনের কর্মপদ্ধতি। এটা কি ঠিক?' মহারাজ বললেন, ''অবশ্য নিয়মকানুন সেভাবে কিছু নেই, তবে তোমরা ঠাকুরের

সন্তানদের অনুসরণ করো না তাই এত গোলমাল। আমরা ঠাকুর, স্বামীজী, মহারাজকে অনুসরণ করি, বড়দের মানে বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, এঁদের সম্মান করি, তাঁদের কথা মান্য করে কাজ করি। তোমরাও সেভাবে করলে সব ঠিক চলবে। নিয়মকানুনের বাঁধাবাধি নিয়মকানুনকেই বড় করে, পারস্পরিক শ্রদ্ধাকে নষ্ট করে।"

শ্রীমায়ের যিনি সেবক, শ্রীমায়ের নামে যাঁর আনন্দ, তাঁর হৃদয়ে মাতৃভাব বিকশিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কী? এই মাতৃভাবে মুগ্ধ এক বিদেশিনী তাঁকে মা হিসাবে দেখতেন। পারিবারিক বিরোধের জেরে যোগীন-মার অনাথ নাতিরা বাড়ি থেকে বিতাড়িত। তাদের মা-বাবা দুজনেই গত, অতএব আশ্রয় উদ্বোধন, যেখানে মায়ের মতনই হাত বাড়িয়ে আছেন স্বামী সারদানন্দ। ছোট নাতি, পরবর্তী কালে স্বামী নির্লেপানন্দ স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, তিনি সেই অশ্রুভারাক্রান্ত বালকদের শুধু গ্রহণই করলেন না, ভাল করে খাইয়ে নিজের বিছানায় শোয়ালেন এবং সে-ব্যবস্থা চলতে লাগল। ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঘর থেকে চলে যাওয়ার সময় পুবের জানালাটা বন্ধ করে যেতেন যাতে মুখে রোদ পড়ে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত না হয়।

স্বামী সারদানন্দ

বাহ্যত তাঁর একান্ত বলে আর কিছুই ছিল না, কিন্তু মনের একান্ততা ছিল অসীম গভীর। কয়েকজন তরুণ ব্রহ্মচারী উচ্চৈঃস্বরে গল্প, হাসাহাসি করছে। গোলাপ মা সহ্য করতে না পেরে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন এই বলে যে, উপরে মা রয়েছেন, নিচে শরৎ মহারাজ কাজ করছেন অথচ তাদের একটু সমীহ বোধ নেই। শুনে সারদানন্দজী বলছেন, ''ছেলেরা অমন হৈ-চৈ করে, তাই বলে কি তাতে কান দিতে আছে?... কানটাকে বুঝিয়ে দিয়েছি, 'তুই তোর প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া শুনিস না।' কান তো কই কিছুই শোনে না!"

একদিন মহারাজ ঝোলভাত খাচ্ছেন। খানিক পর সেবক জিজ্ঞাসা করলেন, ''ঝোলটা কেমন হয়েছে?" মহারাজ পুনরায় একটু মুখে দিয়ে বললেন, ''আজ ঝোলে নুন দিসনি।" সেবক অবাক হয়ে বললেন, ''এতক্ষণ খাচ্ছেন, নুন একটু মাখলেন না কেন?" মহারাজ বললেন, ''বুঝতে পারিনি, এতক্ষণ জিহ্বাটা খাচ্ছিল কিনা।"

সেবাপ্রাণতা তাঁর সমবেদনায়, তাঁর দৃষ্টিতে ঝরে পড়ত! তাই কেউ অসুখে পড়লে—তা তিনি কনিষ্ঠ সাধুই হোন বা গুরুভাইরা—তাঁকে নিজেদের শয্যাপার্শ্বে দেখতে চাইতেন। প্রথম জীবনে অভেদানন্দজীর পায়ের দুরারোগ্য ক্ষত রোজ পরম মমতায় ধুইয়ে বেঁধে দিতেন। ওই মমতাপূর্ণ শুশ্রূষা না পেলে হয়তো তাঁর পা-টিই নষ্ট হয়ে যেত। পুরীতে স্বামী তুরীয়ানন্দজী অসুস্থ, শরৎ মহারাজকে পাশে চাইছেন। রোজ কলকাতার গাড়ির সময় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন আর সময় পেরিয়ে গেলে গম্ভীর হয়ে যান। শরৎ মহারাজ খবর পেয়েছেন কিন্তু বাবুরাম মহারাজও অসুস্থ, তাঁরও ইচ্ছা যে তিনি কাছে থাকুন। শরৎ মহারাজ কদিন পরে পুরী গিয়ে হরি মহারাজের কাছে কয়েকদিন কাটিয়ে

তাঁকে সঙ্গে করে উদ্বোধনে ফিরলেন। বলরাম ভবনে বাবুরাম মহারাজ এবং উদ্বোধনে হরি মহারাজ, দুজনেরই সেবা চলতে লাগল।

মহারাজের জীবনের শেষদিকের একটি ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন স্বামী অশেষানন্দ। তিনি তখন তাঁর সেবক। এক দুপুরে সারদানন্দজী কাউকে না বলে উদ্বোধন বাড়ি থেকে বেরোলেন। সদাজাগ্রত সেবক তাঁর অনুসরণ করলেন। তিনি ট্রামে চেপে এজরা স্ট্রিটে পৌঁছে এক হোটেলের ঘরে গেলেন। সেখানে ভিন প্রদেশের এক ব্যক্তি যক্ষ্মারোগে শয্যায় শায়িত। রোগী তাঁকে পেয়ে আনন্দে উদ্বেল। তার উচ্ছল কথাবার্তা কাশির দমকে বিঘ্নিত হতে লাগল এবং এসবের মধ্যেই সে তার নোংরা বিছানায় মহারাজকে বসতে দিল। সেবক সভয়ে দেখেন, সে নোংরা হাতেই একটি ফল কেটে মহারাজকে নিবেদন করল। মহারাজ অম্লানবদনে তা গ্রহণ করে বিদায় নিয়ে বেরোতে সেবকোচিত অনুযোগ করে অশেষানন্দ বললেন, ''ওই ভয়ংকর ছোঁয়াচে রোগীর হাঁচি কাশীর মধ্যে নোংরা ছোঁওয়ামাখা ফল খাওয়া কি উচিত হল?'' মহারাজ বিব্রতমুখে বললেন, ''জানিস ঠাকুর বলতেন ভক্তি করে দেওয়া জিনিস গ্রহণ করলে কিছু হয় না।'' সেবক বুঝলেন মৃত্যুপথযাত্রীকে মনঃকষ্ট দেওয়া মহারাজের পক্ষে অসম্ভব।

শরৎ মহারাজের জীবনের বিশাল কর্মকাণ্ডের শেষপর্বটি হল শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগ্রাহীদের মহাসম্মেলন, যেটি ভবিষ্যতের কর্মপন্থার দিগ্‌দর্শন। তিনি বুঝেছিলেন কোনও একক ব্যক্তির পক্ষে এই সঙ্ঘের উত্তরোত্তর বিশাল কর্মকাণ্ডের ভার সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। কোনও কর্মের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিশ্চিতরূপে দর্শন বা অনুমান করার ক্ষমতাও হ্রাস পাবে ক্রমশ। তাই ওই সম্মেলনের শেষে এক কার্যকরী সভা গঠন করে দিলেন, যার গরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে সমস্ত কার্য নির্বাহ হতে থাকবে। পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজী বলতেন যে তিনি ওইসময় সভায় একটি কথা বলেছিলেন, "There is joy in being instrument in the hands of God and there is joy too in being set aside." আমাদের মনে হয় কর্ম ও আধ্যাত্মিকতার এক নিখুঁত সমন্বয়ের আভাস আছে উক্তিটিতে। ভগবানকে নিয়ে কাটাতে পারলে কোনও অবস্থাই নিরানন্দের নয়।

ঠিক এর আগেই মহারাজ এযুগের শক্তিপীঠ জয়রামবাটীতে মাতৃমন্দিরের উদ্বোধন করেছেন। সেখানে মাতৃভাবে ভাবিত হয়ে অগণিত প্রার্থীকে দীক্ষা দিয়েছেন। এবারে অবসর নিলেন আর সবাই দেখল এই বিশাল কর্মী মানুষটির—There is joy too in being set aside. সকালে চা খেয়ে জপে বসেন। সেই আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর ঘরটিতে সেবক দেখেন নিশ্চল হাত থেকে জপের মালা খসে পড়া এক সমাহিত মূর্তিকে। কখনও উঠতে দ্বিপ্রহর পার হয়ে যায়; দিনে দিনে ডুবে যান নিজের মধ্যে। সেই সঙ্গে শ্রীমায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর হৃদয়ে মাতৃভাব যেন উথলে উঠতে থাকে। এ-বিষয়ে শ্রীমায়ের আশ্রিতা সুশীলাবালা দেবী স্মৃতিচারণ করেছেন : ''তারপর ১৯২০ সালে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দেহ গেল... বহুদিন আর উদ্বোধনে যাই নাই... মনটা হা হা করিত। তবু শেষে একদিন উদ্বোধনে গেলাম... দেখিলাম মহারাজ... দ্বিতলে মায়ের ঘরের পার্শ্বের ঘরটিতে একখান খাটে বসিয়া আছেন আর অনেকগুলি সধবা-বিধবা মেয়ে নিচে মেঝেতে বসিয়া আছে ও সব কথা তাঁহাকে নিবেদন করিতেছে।... অনেক কথা শুনিলাম—মায়ের অভাব যেন বুঝিতে পারিলাম না।... আজ মনে পড়ে, প্রত্যেক একাদশীর দিনে তাঁহার অভাগিনী বিধবা মেয়েগুলির জন্য ঠাকুর ও মাকে লুচি ও সন্দেশ নিবেদন করিয়া বসিয়া থাকিতেন।... কত দরিদ্র অনাথা মেয়েই তো তাঁহার ছিল! এইসব ব্রত

নিয়মের দিনে কে তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিত?''

পূজনীয়া ভারতীপ্রাণাজীর স্মৃতি—''মা ঠাকুরানীর শরীর যাওয়ার পর একদিন শরৎ মহারাজের ঘরে প্রবেশ করেই দেখি 'মা'ই বসে আছেন। বিস্মিত ও ভীত হয়ে প্রবেশ করা সম্ভব হল না। যোগীন-মাকে এই কথা বলাতে তিনি বললেন, 'এর আর কি? শরতের শরীর অবলম্বনে ''মা''ই রয়েছেন।' ''

এই করুণা ছিল শেষদিন পর্যন্ত। তখন তিনি অসুস্থ, আংশিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত, সমস্ত চিকিৎসা বিফল হয়ে যাচ্ছে। পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজী বলেছেন, ''আমরা তখন অনঙ্গ মহারাজের নেতৃত্বে হোম চণ্ডীপাঠ এইসব করছি। আশা যদি কিছু হয়। তারপর হোমিওপ্যাথ ডাকা হল। ডাক্তার অমর মুখার্জি এলেন, খুব নামকরা ডাক্তার তখনকার দিনে। তিনি মঠ ও মিশনের সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত ছিলেন না। তিনি ওষুধ দিলেন—মহারাজ তখন তাকাচ্ছেন। আমরা ছেলেমানুষ—বিশেষ কিছু বুঝি না তখন, কিন্তু বড়োরা বললেন যে সে চাহনি অর্থবহ। সত্যিই তাই; কারণ অমরবাবু সে চোখে কি দেখলেন জানি না, তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। তারপর থেকে তাঁর জীবনধারা সম্পূর্ণ পালটে গেল, খুব ভক্ত হয়ে গেলেন। পরবর্তী কালে তিনি বলতেন, 'তাঁর দৃষ্টিতে কি ছিল জানি না, তবে তিনি আমার অন্তর ভরে দিয়েছেন, প্রাণে প্রাণে তাঁর কৃপা অনুভব করছি'।''

সিদ্ধিলাভ তো তাঁর কবেই হয়েছে। বালক শরতকে কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বলেছিলেন, ''কি রে তুই কিছু চাইলি না যে?'' শরৎ বলেছিলেন, ''আমি যেন সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করি এরূপ করে দিন।'' ঠাকুর বললেন, ''ও যে শেষের কথা রে! তা তোর হবে।'' সাধারণ মানুষ আমরা, আমাদের কাছে এই বিষয়ের কথা কেবল শব্দমাত্র, তার বেশি কিছু নয়। তাঁর অদ্ভুত ভালবাসা, তাঁর অতুলনীয় কর্মদক্ষতা, সবাইকে একান্ত আপনার করে নেওয়া, এ-গুণগুলিই আমাদের আপ্লুত করে রাখে। আমরা দু আনা মদে মাতাল হই তবু শুঁড়ির দোকানে মদের পরিমাণ কত আছে তা জানতে ছুটি। তাই তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা জানতে কৌতূহল জাগে। অসিতানন্দ স্বামীর পুনঃপুনঃ প্রশ্নের উত্তরে স্বামী সারদানন্দজী বলেন, ''লীলাপ্রসঙ্গে নির্বিকল্প সমাধির বর্ণনা আছে তো? লীলাপ্রসঙ্গের কোনও কথা আমি না জেনে লিখিনি।'' অক্ষয়চৈতন্য মহারাজ লিখছেন, ''স্বামী ব্রহ্মানন্দজী শেষ সময়ে শরৎ মহারাজকে শয্যাপার্শ্বে দেখে বলছেন—'ভাই শরৎ এসেছিস... তুই ব্রহ্মজ্ঞানী, আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দে না, সব গুলিয়ে যাচ্ছে আমার'।'' স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ তাঁর অনুভূতির কথা জানতে পীড়াপীড়ি করলে তিনি উদ্বোধনে নিচের ছোট ঘরটিতে বসে পিছনের দেওয়াল আলমারিটি অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলছেন, ''এটিও যে ব্রহ্মবস্তু, ঠাকুরের কৃপায় সে অনুভব হয়েছে।''

এই অনুভবে স্থিত হওয়ার পরও তাঁর যে নিরলস কর্মপ্রবৃত্তি আমরা দেখি, তা গীতার 'নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি'-র মূর্ত রূপ। সমগ্র জীবনটি তিনি পরার্থে কাটিয়ে গিয়েছেন। তাঁর প্রথমজীবনের জ্ঞান ও সাধনা পরবর্তী কালে অদ্ভুত কর্মশক্তিতে প্রকাশ পেয়েছিল।

শেষকালে সেটিই আবার মাতৃভাবে, স্নেহে, বাৎসল্যে ভক্তদের প্লাবিত করে রেখেছিল। শরৎকালে 'ঘাসের আগায় শিশিরের' আর্দ্রতা নিয়ে যেমন প্রান্তর জেগে থাকে, তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণমুখী শরতের জীবন তাঁর অপরিসীম করুণা, ভালবাসা ও সর্বাশ্রয়ী ভাবটি দিয়ে ভক্তের হৃদয়মনকে এক অবর্ণনীয় আর্দ্রতায় ভরিয়ে রাখে আজও।